International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-I, January 2023, Page No.24-34
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i1.2023.24-34

দক্ষিণ ভারতের উপকূলীয় এলাকা ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় এলাকার লৌকিক দেব-দেবীর তুলনামূলক স্বরূপ সন্ধান

স্বস্তিকা দে
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড. শান্তনু দলাই
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
This paper mainly focuses the 'Loukik Debata'. The word 'Loukik' is generally derived from 'Lok' which means people coming from the lower strata of the society. So 'Loukik Debata' means folk God or minor God worshipped by the rural people having traditional beliefs. Those gods are firmly believed to be the saviours of the rural coastal areas of the both South India and Bengal. The Coromondal and Malabar Coasts are mainly comprised with the states Andhra Pradesh, Tamilnadu, Karnatak, Kerala and Goa of South India and West Bengal is included in the Utkal Coast. It is true that those coastal areas face the natural calamities first by the impact of the whims of nature. Besides, the coastal people are compelled to depend on the sea especially for their livelihood. So attempt is followed to compare the Gods and the Goddesses of the periphery of South India and Bengal. In fact, there are similarities between the minor Gods of coastal areas of South India and West Bengal. Through extensive survey including discussions it has been found that people of both coastal areas worship the same Gods and Goddesses, but their retuals are being performed in various ways according to their own beliefs. For example the Goddesses named as 'Saptamatrika' or 'Pidam', Tripurasundari, Visalakshi, Kamalakshi, Devichemmin, Mariamman, Periyapala, Yattamman of South India can be compared as Satbibi, Satbouni, Durga, Parbati, Manasa, and Sitala of Bengal. Moreover, Gods of South like Ganesha, Kartikeya, Natrayan, Pannar and Sankar, Pulipani are compared to Bengal's Gods named as Dakshin Roy, Shib Thakur, Panchu Thakur, Makal Thakur etc. Despite such diversions there is an inherent similarity which reminds us the saying – 'India is a land of Unity in diversity'. However, the ultimate motto of such comparative study is to prove the cultural similarity from extreme South to East along the Coromondal Coast via Odisha and Bengal Coast. Besides this comparative explication of folk Gods will exclusively highlight

the cultural and religious trend of both South and East Coast of India ushering to the future researchers to have unique findings.

Key words: Loukik Debata, Coast, South India, West Bengal, Comparison, Culture, religion.

ভৌগোলিক বিচারে ভারতের মোট সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা ৭৫১৬.৬ কিমি। এর মধ্যে দক্ষিণ ভারতের করমণ্ডল ও মালাবার সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা অন্তর্গত। এই এলাকা দুটির মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালা, গোয়া, রাজ্যগুলি অবস্থিত। এছাড়া রয়েছে উৎকল উপকূলীয় এলাকা। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে। মূলত উত্তরে হিমালয় বাদ দিলে দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি আরব সাগর, ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগর অধ্যুষিত। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের দক্ষিণাংশের সঙ্গে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যে জলপথে যোগাযোগ অবাধ হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাভাবিক চলতে থাকায় করমণ্ডল উপকূলের সঙ্গে উৎকল উপকূলের অর্থনৈতিক সম্বন্ধ যেমন গভীরতর হয়ে ওঠে, তেমনি সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনও প্রকটিত হয়। এই সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের অন্যতম কারণ হলো লোকধর্ম ও লোকবিশ্বাসগত ঐক্য। আমরা এই নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্যরূপে রেখেছি দক্ষিণ ভারত এবং ওড়িশার উপকূলীয় লৌকিক দেব-দেবীর সাথে মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনা জেলার লৌকিক দেব-দেবীর তুলনামূলক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ। ওড়িশা ও সমগ্র দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সাযুজ্যের নিম্নোক্ত কারণগুলি আমাদের এই নিবন্ধে উপস্থাপন করেছি। কারণগুলি যথা–

ক) ভারতের বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণাংশ এবং পূর্ব ভারতের দক্ষিণাংশ বঙ্গোপসাগর ও আরবসাগরের মধ্যে নিহিত থাকার জন্য জলপথে যোগাযোগ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানকে বহমান রেখেছে।

খ) জীবিকার অন্বেষণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে করমণ্ডল উপকূল ধরে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা এবং দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

গ) প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে জনজীবনের স্থানান্তর এবং অবস্থানগত পরিবর্তনের ফলে ভাষা ও ধর্মের আদান-প্রদান লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্য করা গেছে সাহিত্য সংস্কৃতির আশ্চর্য মেলবন্ধনের। ফলে লোককথা, পুরাণ, দর্শন, ধর্মীয় প্রথা প্রভৃতির সঙ্গে বাংলার মিল প্রকট।

ঘ) মেদিনীপুরের ভৌগোলিক অবস্থান মানচিত্রগতভাবে পূর্ব ভারত হলেও একনজরে দক্ষিণ ভারতের ভূপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে। দক্ষিণ ভারতের প্রবেশদ্বার এই জেলার শব্দকোষে লুকিয়ে আছে দ্রাবিড় ভাষার আন্ত:প্রকৃতি। অতীতকালের ইতিহাস বলে এই অঞ্চল এককালে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করত। এই অঞ্চলের ভাষা-সংস্কৃতি এবং মন্দির ভাস্কর্যে দ্রাবিড়িয়ান সংস্কৃতি এখনো পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। পাল ও সেন যুগে এই সমুদ্র অববাহিকায় এসে বসতি স্থাপন করে দ্রাবিড় অধিবাসীরা। অরণ্য নিধন করে বাসস্থান তৈরি করা এবং মৎস্য শিকার করা এদের ছিল জীবিকা। যার ফলে দক্ষিণ ভারত তথা দ্রাবিড়ভূমির সমুদ্রজীবীদের সঙ্গে মেদিনীপুরের সমুদ্রজীবীর যথেষ্ট মিল থাকা স্বাভাবিক।

উপরোক্ত কারণগুলি থেকে আমরা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, দক্ষিণ ভারতের লৌকিক দেব-দেবীর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের ধর্মীয় সংস্কৃতি সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে

গেছে। এই উভয় উপকূলীয় পরিবেশে লৌকিক দেবদেবীর স্বরূপ সন্ধান করে তাদের আন্ত:সম্পর্ক, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো ফুটিয়ে তুলতে চাই।

লৌকিক দেবতার স্বরূপ: প্রসঙ্গক্রমে লৌকিক দেব-দেবীর স্বরূপ উদ্ঘাটন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লৌকিক দেবতা বলতে Folk God অর্থাৎ লোকসমাজের আরাধ্য দেবতা অপরদিকে শিষ্ট সমাজের পূজিত দেবতা হলেন Higher God বা শাস্ত্রীয় দেবতা। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের পূর্বে যে দেবতাগণ নিম্নবর্ণের দ্বারা পূজিত হতেন তাঁরাই লোকদেবতা। আদিম নৃগোষ্ঠী বহুত্ববাদী দৈব অস্তিত্বে বিশ্বাসী। জীবন-জীবিকা, গোষ্ঠী, বাস্তব বোধ, বিজ্ঞানচেতনা ও যুক্তিবোধের অভাবের কারণে সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে কালের প্রবহমানতায় অঞ্চল বিশেষে অতিপ্রাকৃত শক্তিকেই দৈবশক্তিরূপে মান্যতা দেওয়ায় লৌকিক দেবদেবীর নানাবিধ রূপ পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া মানুষ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানা রূপে পূজা করে প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেছে। মানুষ স্বাস্থ্য রক্ষা করতে গিয়ে এবং রোগমুক্ত জীবন পাওয়ার জন্য কোন না কোন অলৌকিক শক্তির আশ্রয় নিয়েছে এবং তাকে রক্ষাকর্তা বা পালনকর্তা হিসেবে পূজা করেছে। যে সব প্রাণী মানুষের প্রাণঘাতক -- তাদেরকে বশে আনতে কিংবা তাদের থেকে অব্যাহতি পেতে নানা শ্রেণির প্রাণীকে মানুষ পুজো করতে শুরু করেছে।

বর্তমান নিবন্ধে দেব ও দেবী এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করে তাদের স্বরূপ এবং মাহাত্ম্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি অন্যান্য প্রাদেশিক লৌকিক দেব-দেবীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রথমে আমরা লৌকিক দেবীদের নিয়ে আলোকপাত করবো।

ক) সপ্তমাতৃকা ও সাতবিবি: উপকূল অধ্যুষিত দক্ষিণ ভারতে লৌকিক দেবী হিসেবে 'সন্তমাতৃকা' অন্যতম--- যাঁর স্থানীয় নাম 'পীডম' বা কান্যিমার স্বামী অর্থাৎ কুমারী কন্যা। তামিলনাড়ু ও কেরালায় সপ্তমাতৃকা দেবীকে নানা মূর্তিতে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা পূজা করে; কিন্তু উচ্চবর্ণের মানুষ সহ এমনকি ব্রাহ্মণেরা দেবীকে অর্ঘ্য দান করেন। মূলত শিবের অনুচরী হিসেবে এই সপ্তমাতৃকাদের দেবীরূপে গণ্য করা হয় --- যাঁর কাছে মানুষ শষ্যসমৃদ্ধির কামনা করে থাকেন। মাটি ও পাথরের মূর্তি গড়ে কিংবা স্তূপাকার ভাবে এই দেবীর পূজা করা হয়। মূলত কৃষক এই দেবীদের পূজা দিয়ে চাষবাস শুরু করে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গাসহ এই সপ্তমাতৃকা সুন্দরবন এলাকায় 'সাতবিবি' নামে খ্যাত। উপকূলীয় জীবনে এই দেবীর গুরুত্ব জেলে-মাঝিদের জীবনে সর্বাধিক, কারণ সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবার আগে, তারা 'সাতবিবিকে' পূজা দেয়। দক্ষিণ ভারতে 'সপ্তমাতৃকা' দেবী মূলত শিবের অনুচরী। কার্তিকের জননী ও কৃষিদেবী- যাঁদের স্থানীয় নাম- 'ঐন্দ্রী', ব্রাহ্মী, মহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, বরাহী, কৌমারী,মা-অসুরী।' এদের পূজা বিধিতে শাস্ত্রীয় অনুসঙ্গ আছে, যার ফলে উচ্চবর্ণের সমাজে এরা পুজিত হয়ে আসছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 'সাতবিবি'র নামগুলি পাওয়া যায় পালা গায়কদের কাছ থেকে, তা হল --- ''(১) ওলাবিবি, (২) ঝোলাবিবি, (৩) ডাবিবি, (৪) ডঙ্কারবিবি, (৫) আজগৈবিবি, (৬) আসানবিবি, (৭) ঝেটুনেবিবি।''[২]- এরা প্রত্যেকেই এক একটা রোগের দেবীরূপে চিহ্নিত। আবার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর মতে সাতবিবির নাম- 'ওলা, ঝোলা, আসান, আজগৈবিবি, চাঁদ, বাহড়, ঝেটুনেবিবি।' দক্ষিণ ভারতের 'সপ্তমাতৃকা' এবং বাংলায় 'সাতবিবি' সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রমাণ করে যে এই লৌকিক দেবীর প্রতি লোকসমাজের ভক্তি, বিশ্বাস থাকে ঠিকই, কিন্তু এই দুই প্রকার দেবীর উদ্ভবের ইতিহাস ও পূজা পদ্ধতি ভিন্ন। আমরা অনেকেই জানি যে সপ্তমাতৃকার পূজা মহেঞ্জোদারো থেকে পাওয়া একটি পোড়ামাটির ফলক দেখে বোঝা যায় যে

প্রাগৈতিহাসিক যুগেও তা প্রচলিত ছিল। বলা হয়েছে- "Mr Earnest makey তাঁর 'Early Indus civilization' নামক পুস্তকে উক্ত সাতটি নারী মূর্তিকে দেবী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।'[৩] - ফলে সাতবিবি ও সপ্তমাতৃকা দেবী ভারতের নানা স্থানে নানা নামে লোকবিশ্বাস অনুযায়ী পূজিত হয়ে আসছে।

খ) সাতবোন: দক্ষিণ ভারতে সাতটি বনদেবী বোনের সম্মিলিত পূজা হয় - যা 'সপ্ত-কালিংগেস' নামে খ্যাত। এঁদের মধ্যে একজনের নাম 'মানাক্ষি', অন্যান্য ছয় জন তাঁর বোন। বাংলায় চব্বিশ পরগণায় সাতবোনদের যে পূজার্চনা হয়ে থাকে দক্ষিণ ভারতের নানা গ্রামে একই উদ্দেশ্যে মীনাক্ষি ও তাঁর ছয় বোনের পূজা হয়ে থাকে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এই দেবীর পূজা করে থাকেন। হিন্দুদের দ্বারা পূজিত দেবীর আকৃতি লক্ষ্মী-সরস্বতীর মতো এবং মুসলমান এলাকায় মুসলিম মেয়ের মতো। মনীষীদের কেউ কেউ বলেছেন গ্রাম বাংলার দরিদ্র শ্রেণির মানুষদের পূজিত সাত বোন শাস্ত্রীয় 'সপ্তমাতৃকা' থেকেই সৃষ্ট। কারণ স্বরূপ বলা যায় রাঢ় বাংলার যে যে জায়গায় এই সাতটি লৌকিক দেবদেবীর পূজা ছড়িয়ে আছে, সেই সেই এলাকায় সপ্তমাতৃকা পূজার গুরুত্ব ছিল। এ বিষয়ে এটা অনুমিত যে গ্রামের প্রান্তিক সমাজের যখন শাস্ত্রীয় দেব দেবীর পূজায় অধিকার ছিল না তখন 'সাতদেবী ভগ্নী'-র উদ্ভব ঘটেছিল। বলা যায় এই দেবীগণ কালের অনুক্রমে 'সাতবোন' বা 'সাতবউনী' রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। সমালোচকের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য - 'পল্লীর অনুন্নত সমাজ যখন শাস্ত্রীয় দেবতা পূজায় বঞ্চিত ছিল, সে সময়ে সপ্তমাতৃকার অনুকরণে তাদের কল্পনা অনুযায়ী তারা এই 'সাতদেবী ভগ্নী'-র সৃষ্টি করেছিল, সেই দেবীরা কালক্রমে কোন স্থানে 'সাতবোন' অন্যত্র 'সাতবউনী' হয়েছেন।'[৪]

গ) ত্রিপুরাসুন্দরী: তামিলনাড়ুর ত্রিচিনাপল্লী ও মাদুরাইতে পাহাড়ের উপর পাথরের তৈরি চতুর্ভুজা কিংবা দ্বিভুজা মূর্তির পূজা প্রচলিত। কুমারী মেয়েরা প্রতি মঙ্গলবারে উপবাস থেকে পর পর ছত্রিশ সপ্তাহ এই দেবীর পূজা করে ভালো বর পাওয়ার জন্য। তাঁদের মতে দেবী মীনাক্ষী তথা ত্রিপুরাসুন্দরী একজন বরদাত্রী। তাই প্রথানুযায়ী প্রতি মঙ্গলবার দেবীর কাছে জ্বালা হয় দুটি করে দীপ। তারপর দুটি পাতিলেবু মাঝ বরাবর কেটে রস বের করে দিয়ে উল্টে দেওয়া হয় এবং তাতে সলতে ও তেল দিয়ে দীপরূপে প্রজ্জ্বলিত করে দেবীর কাছে রাখা হয়। কুমারীরা হেঁটে মন্দিরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে, কিংবা পা মেপে মেপে নির্দিষ্ট সংখ্যা মতো মন্দিরের চারদিকে ঘোরে এবং মানত করে। দেবীর কৃপায় মনের কামনা পূর্ণ হলে স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে দেবীকে নানা ফল সহকারে পূজার অর্ঘ্য দান করে। পুরাণ অনুযায়ী দেবাদিদেব শিবকে স্বামীরূপে পাওয়ার জন্য পার্বতী কঠোর সাধনা করেন এবং শিবের ধ্যান তাতে ভেঙে গেলে তিনি নিজেই তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হন। পুরাণের কাহিনির প্রতি বিশ্বাস রেখে কুমারীরা শিবের মতো বর পেতে এই দেবীর ব্রত করে। বাংলার কুমারীরা শিবচতুর্দশীর দিন রাত জেগে শিবের মাথায় জল ঢালেন একই উদ্দেশ্যে। দক্ষিণের ত্রিপুরা সুন্দরী অনেকাংশে পার্বতী, আবার মীনের মতো চোখ বলে অঞ্চল ভেদে তাঁর নাম মীনাক্ষী। বাংলার সুন্দরবন এলাকায় ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির আছে। তাই সমালোচক বলেছেন– ‘‘দক্ষিণ ভারতের সাথে পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রপোকূল বরাবর যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, ত্রিপুরা সুন্দরীর পূজা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।’’[৫]

ঘ) বিশালাক্ষী: মাদ্রাজের কাঞ্চিপুরম ও চিদাম্বরম নামে দুটি জায়গায় বিশালমারি নামে লৌকিক দেবীর মূর্তিপূজা হয়। কাঞ্চিপুরমে চারহাত দেবী এবং চিদাম্বরমে দুহাত বিশিষ্ট দেবীর মন্দির আছে– যিনি পার্বতীর কল্পিত রূপ। কর্ণাটকের গ্রামদেবী বিশালমারির আকৃতি এবং পূজা-পদ্ধতির সাথে বাংলার বাসন্তী দেবীর আকৃতি ও পূজা-পদ্ধতির যথেষ্ট মিল রয়েছে। অনার্য দেবী বাসুলী পরবর্তীকালে বিশালাক্ষী রূপে পূজিত হয়ে আসছে। সমালোচকের উক্তি স্মর্তব্য– "The Goddess vasuli obviously a non-Aryan name is

sometimes called Vishalakshmi"[৬] "Ashutosh Bhattacharya, The cult of village Gods of West Bengal)। সুন্দরবন এলাকায় এই বিশালাক্ষীর অসংখ্য মন্দির রয়েছে- কারণ সমুদ্র নির্ভর তথা উপকূলীয় প্রাকৃতিক সংকট থেকে অব্যাহতির জন্য মানুষ এই বিশালাক্ষীর আরাধনা করে আসছেন। এই বিশালাক্ষী প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থে নেই। তবে বাংলাদেশে কয়েকটি জেলায় সমাজের প্রান্তিক তথা নিম্নশ্রেণীর মানুষের পৌরহিত্যে বিশালাক্ষী দেবীর পূজা হয়ে থাকে। কেউ কেউ তাঁকে অনার্যদের তান্ত্রিকদেবী 'বাসলী' রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'এ বলেছেন দাক্ষিণাত্যের যিনি বিসালমারী বাংলার তিনি বাসলীদেবী। শ্রদ্ধেয় বিজয়চন্দ্র মজুমদার সহ কয়েকজন মনীষী এই দেবীকে 'দ্রাবিড় দেশাগতা' বলে আখ্যা দিয়েছেন। ভাষাতত্ত্বের বিচারে বলা হয়েছে- বাগীশ্বরী> বাইসরী> বাসরী> বাসলী। তবে এইভাবে বাসলী শব্দের সৃষ্টি সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে মহীশূর কর্ণাট অঞ্চলে গ্রামদেবী বিসলমরী ও বিশালাক্ষীর মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের মন্দিরে চারকোণে যে চারটি মন্দির রয়েছে- তার মধ্যে একটি বাশুলীর। তাই ওড়িশায় বাসলী তথা বিশালাক্ষীর পূজা প্রচলিত। ফলে ভারতের নানা স্থানে বিশালাক্ষীদেবীকে বাসলীরূপেই পূজা করা হয়। চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে ধীবরদের দ্বারা এই বিশালাক্ষী পূজিত। ফলে বাংলা এবং দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে বিশালাক্ষীদেবীর পূজা প্রচলিত- যা উভয় স্থানের সংস্কৃতির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঙ) কামাক্ষী: দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে সালংকারা, চতুর্ভুজা লোকদেবী কামাক্ষীর পূজা হয় - যাঁর বাহন সিংহ। এখানে মহিলারা সন্তান কামনায় ঢিল বেঁধে মানত করেন। সন্তান জন্মাবার পরে যদি দেখা যায় কারোর কন্যা সন্তান হয়েছে, তাহলে সেখানে একটি দোলায় সন্তানকে শুইয়ে রেখে মা চলে যেতেন। আগে সেই কন্যা সন্তানকে বিশেষত তামিলনাড়ুতে বাবা-মা মেরে ফেলতেন; কিন্তু সেখানকার পান্ডিয়া রাজাদের একজন নতুন নিয়ম চালু করেন এই ঘোষণা করে যে- যাঁরা কন্যা সন্তান চান না তাঁরা সন্তানকে মেরে না ফেলে দোলায় শুইয়ে দিয়ে চলে যাবেন। ফলে অসংখ্য কন্যা সন্তান রাজানুকূল্যে পালিত হোত। বর্তমানে কন্যা সন্তান রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। এই কামাক্ষীদেবী দক্ষিণ ভারতের মাতৃকা পূজার প্রতীক- যা দেবী দুর্গার আদিরূপ বলে স্বীকৃত। মূলত উপকূলীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কামাক্ষী দক্ষিণ ভারত ও বাংলার মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছে। পশ্চিমবাংলার হাওড়ার বাগনান, কোচবিহার ও মেদিনীপুরের খড়্গপুরে এই দেবীর মন্দির রয়েছে। উত্তর চব্বিশ পরগণার চন্দ্রকেতুর গড়ে টিয়া হাতে দ্বিভুজা সালংকারা মাটির মূর্তি রয়েছে। দক্ষিণের সমুদ্র উপকূলের সঙ্গে বাংলার উপকূলীয় সংস্কৃতির সংযোগ সেতু হিসেবে এই কামাক্ষী মন্দির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

চ) প্রলয়কালী: প্রলয়কালীর পুজো দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে নানা স্থানে ঘটে প্রলয় থেকে বাঁচার জন্য। নদীবিধৌত দক্ষিণের মালভূমি এলাকা এবং বাংলার উপকূলবর্তী এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়ে ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। তাই দক্ষিণে প্রলয়কালীর পুজো করা হয় এক কুমারী মেয়েকে মন্দিরে দেবী সাজিয়ে। মেয়েটি দেবীরূপে পূজিত হওয়ায় সারা জীবন অরক্ষণীয়া থাকে এবং সকলের মঙ্গলের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে। বাংলায় শরৎকালে দুর্গাপূজার অষ্টমী ও নবমী তিথিতে শিশুকন্যাকে পূজা করা হয় যা কুমারী পূজা নামে খ্যাত। তবে এই কুমারী প্রলয়কালীর মতো অরক্ষণীয়া থাকে না। দক্ষিণ ভারতে বর্ষাকালে যখন নদী প্লাবিত হয় তখন এই দেবীর পূজা বিশেষ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের এক ষোড়শীকে পূর্ণিমা রাতে পূজা করে ভোরবেলা তাকে উলঙ্গ করে হাতে একটি মশাল দিয়ে সারা গ্রামে ঘোরানো হয়। মেয়েটির পরিক্রমাকালীন

কোন পুরুষ ঘরের বাইরে বেরোতে পারেন না। মেয়েটি গ্রাম প্রদক্ষিণ করে ফেরার পর অন্যান্য মেয়েরা তাকে কাপড় পরিয়ে মন্দিরে বসিয়ে পুজো করে। এই প্রলয়কালীরূপে পূজিতা মেয়েটিকে কেউ বিবাহ করেন না– কারণ মানুষ বিশ্বাস করেন যদি কেউ এই মেয়েকে বিবাহ করেন তাহলে প্রলয়ের কোপে সারা গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই গ্রামকে বাঁচানোর জন্য মেয়েটি অবিবাহিতা রূপে সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। বাংলার ক্ষেত্রে কুমারীপূজার মিল থাকলেও দক্ষিণের ষোড়শী কুমারীর মতো আত্মবলি দিতে হয় না। তবে এই প্রলয়কালীর পুজোর তাৎপর্য হোল- সমষ্টির স্বার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দেবার মহত্ব।

ছ) দেবীচেম্মিন: 'চেম্মিন' শব্দের অর্থ Red Fish বা লাল মাছ। দক্ষিণ ভারতের উককূলীয় এলাকার মৎসজীবীরা এক ধরনের লালমাছকে 'দেবী'রূপে গণ্য করে পুজো করেন। তামিলনাড়ুর দেবীচেম্মিন, কর্ণাটকের কানিয়াম্মা মূলত ধীবরদের উপাস্য দেবী। বাংলার 'মাকাল' বা 'মাখাল ঠাকুর'ও জেলেদের তথা মৎস্যজীবীদের উপাস্য লৌকিক দেবতা। হাওড়া, মেদিনীপুর, সুন্দরবন, এমনকি বিভিন্ন গ্রামীণ এবং উপকূলীয় এলাকায় মূর্তিহীন এই দেবতার পূজা প্রচলিত। পূর্ব মেদিনীপুরের 'মহাকাল' ঠাকুর অনুরূপ এক উপকূলীয় এলাকার মৎস্যজীবীদের উপাস্য লোকদেবতা। তবে পার্থক্য হল দক্ষিণের উপাস্যগণ দেবী, কিন্তু বাংলার দেবতা। বাংলার মাকালঠাকুর পূজার কোন যথার্থ স্থান ও কাল নেই। মাছ ধরতে যাবার আগে জেলেরা নদী বা সমুদ্রের তীরে মাটি দিয়ে তিনটি বেদী তৈরি করে এবং তার মাঝখানে একটা বা দুটো প্রতীকী স্তূপ বসিয়ে চারটি তীরকাঠি বেদীর চারকোণে পুঁতে সেগুলি লাল সুতো দিয়ে সীমাবন্ধন করে স্তূপের উপর লাল চাঁদোয়া টাঙানো হয়। স্তূপের উপর সিন্দুর প্রলেপ দিয়ে সামনে ঘট বসিয়ে প্রদীপ জ্বেলে ফুল-তুলসীপাতা সহ নৈবেদ্য স্বরূপ পাকাকলা, বাতাসা, আলোচাল, গাঁজা প্রভৃতি দিয়ে পুজো করা হয়। সুন্দরবন এলাকায় 'আট-মাকাল' ঠাকুরের পুজো করে ধীবররা মাছ ধরতে যায়। দক্ষিণ ভারতের মৎস্যজীবীরা যে কারণে কানিয়াম্মার পুজো করে বাংলার মাকালঠাকুরের পূজাও একই উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয়।

জ) মারিআম্মান: দক্ষিণ ভারতের মারিআম্মান এক লৌকিক দেবী, 'মারি' শব্দের অর্থ 'বদল' এবং 'আম্মান' এর অর্থ 'মা' – তাই শব্দটির অর্থ মাতৃবদল। বসন্ত-হাম জাতীয় রোগ এবং জাগতিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে এই দেবীর প্রাত্যহিক ও বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলায় শীতলাদেবীর পূজাও ব্যাপক ভাবে একই উদ্দেশ্যে ঘটে থাকে। দক্ষিণ ভারতে এই দেবীর নানা মূর্তিতে পূজিত হয়ে আসছে। দেবী কোথাও উঁচু চৌকির উপর এক পা রেখে অন্য পা'টি ঝোলানো পায়ের উপর শব রেখে উপবিষ্টা রয়েছেন, কোথাওবা দেবী অষ্টভুজা নৃমুন্ডমালিনী- যাঁর পায়ের তলায় তিনমুন্ডের অসুর, মাথায় পঞ্চনাগের মুকুট এবং তার পেছনে জ্যোতির্ময় জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, হাতে শূল, পদ্ম, সাপ, ডমরু ও শাঁখ। এই দেবীর নিত্য ও বাৎসরিক পূজা হয়। চালের গুঁড়ো, কলা, ডাল, চাল, ঘি, লেবু, পান, সুপুরি প্রভৃতি উপকরণ পুজোয় লাগে। দেবীর প্রসাদের জন্য ভাতের ফ্যান, টকদই, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা, নিমপাতা, সরষে ও ফোড়ন দিয়ে এক পানীয় তৈরি করা হয়– যার স্থানীয় নাম 'কুড়'। দেবীর সেবক হিসেবে জেলেরা অংশ নেয়। পয়লা চৈত্র থেকে শুরু করে ছয় দিন ধরে পুজো চলে। অষ্টম দিনের অনুষ্ঠানকে বলে 'কারাহাম -'যার অর্থ মাথায় জল ভর্তি কলসী ও হাতে আগুন নিয়ে মেয়েদের গ্রাম থেকে মন্দিরে মিছিল করে আসা। একই দিনে 'তিমেরি' উৎসবে মেয়েরা আগুনের উপর দিয়ে হাঁটে এবং মানত করে। নবম দিনের উৎসবের নাম 'মা-বিল্লাকু-পূজা' – যার অর্থ কলাপাতায় চালের গুঁড়ো রেখে মেয়েদের প্রদীপ জ্বালানো। দশম দিনের শেষ অনুষ্ঠানে 'তালি' অর্থাৎ তামিল এয়োস্ত্রীরা মঙ্গলসূত্র মায়ের গলা থেকে খুলে তার পরিবর্তে একটি হলুদ সূতোয় হলুদ বেঁধে মায়ের

গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়। তার এক সপ্তাহ পরে দুধ, মধু, ঘি, দই, ডাব-চন্দন দিয়ে 'আরণমানাই অলঙ্করম' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবীকে সধবারূপে সাজিয়ে গয়না পরানো হয়। এই অনুষ্ঠানে 'কারাগামঅর্থাৎ ' কাবাডি নামে লোকনৃত্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালিত হয়। এই দেবীর পূজা ,জলভর্তি কলসী নিয়ে নাচ সমৃদ্ধির জন্য করা হয়। বাংলার শীতলাদেবীর পূজা যে -সুখ রোগ থেকে মুক্ত হয়ে ,মূলত জাগতিক দুঃখ কষ্ট দক্ষিণ ভারতের তা ,উদ্দেশ্যে করা হয়মিলনাড়ু, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যে একই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে দক্ষিণভারতীয় সংস্কৃতির এই সমন্বয় দেখতে পাই।

ঝ) পেরিয়পাড়েত আম্মান: সাপের দেবী রূপে তামিলনাড়ু ও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে যে লৌকিক দেবী পূজিত হন তিনি পেরিয়াপাড়েত আম্মান। নদীমাতৃক বাংলার সাপের দেবী মনসা অনুরূপ উদ্দেশ্যে পূজিত। তবে দক্ষিণে যিনি আদিবাসীদের লোকদেবী, বাংলার তিনি উচ্চনীচ নির্বিশেষে সব শ্রেণির দ্বারা পূজিত। দক্ষিণ ভারতে এই দেবীর শিলামূর্তি আগে পূজা করা হোত। তিনটি শিলার মাঝখানে অধিষ্ঠিত বড়বোন পেরিয়পাড়েত আম্মান, তাঁর ডানে অঙ্গলা আম্মান এবং বামে চেলি আম্মান। বড়দেবী চতুর্ভুজা যাঁর উপরের হাতে ডমরু এবং নীচের হাতে ছুরি, দেবীর মাথায় সাতফণা বিশিষ্ট সাপ, পরণে হলুদ শাড়ি। দেবীর ঘর পাহাড়ের উপর নারকেল পাতার চটি বেড়া দিয়ে ঘেরা। স্থানীয় আদিবাসীরা ফলমূল দিয়ে দেবীর পূজা করে। তামিলনাড়ুর শীতলাপাকম পাহাড়ে এই দেবীর পূজা হয়। বাংলার সাপের দেবী মনসার সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তবে চব্বিশ পরগনায় শিলাকে নিরাকার দেবীরূপে পূজা করার রীতি এখনো রয়েছে- যার উপর বৌদ্ধ ও ইসলামীক সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। মূলত উপকূলীয় অঞ্চলে রোগ নিরাময়ের জন্য এই তিনটি শিলামূর্তিকে ওলাবিবি, ঝোলাবিবি ও আসানবিবি নামে পূজা করা হয় ।

পাশাপাশি দেব অর্থাৎ পুরুষ দেবতার স্বরূপ সন্ধান করার প্রয়োজন। আমরা এই নিবন্ধে যে সমস্ত দেবতার কথা উল্লেখ করব তারা প্রায়শই শাস্ত্রাচারে পূজিত হন। কিন্তু সেই দেবতাদের স্বরূপ উন্মোচন করে তাদের মধ্যে যে লৌকিক দেবদেবীর স্বরূপ লুকিয়ে আছে তা বাংলার লৌকিক দেবতার সাথে তুলনামূলক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

১) গণেশ: ভারতের প্রায় সর্বত্র গণেশ ঠাকুরের পূজো হয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গণেশকে সিদ্ধিদাতা রূপে শিব-দুর্গার পুত্র বলা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে এই গণেশ মৎস্যজীবীদের লোকদেবতা। আষাঢ় মাসে জেলেরা গভীর সমুদ্রে 'কাঠমারান' বা নৌকাতে করে মাছ ধরতে যাবার আগে বধূরা এই নৌকাকে বিঘ্নেশ রূপে পূজা করে। বাংলায় উপকূলীয় এলাকায় ধীবররা একেই মাকাল ঠাকুররূপে পূজা করে।

২) কার্তিকেয়: দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে কার্তিকের থান আছে যেখানে লোকদেবতা রূপে তাঁর পূজা বহুল প্রচলিত। বাংলায়ও এই কার্তিকের পূজা খ্যাত। তামিলনাড়ুতে ভেষজ কুরাবৃক্ষ কার্তিকরূপে পূজিত। পূর্ব ভারতে দেব সেনাপতি বীররূপে কার্তিকের মূর্তি পূজিত হয়। এই লোকদেবতার পূজার্চনা সম্প্রদায় নির্বিশেষে লোকসংস্কৃতির মিলনসূত্ররূপে বিচার্য। দক্ষিণ ভারতে পালানিহিলে কার্তিকের পূজা হয় সকালে। অভিষেকের সময় তিনটি হাতি উপর থেকে নেমে এসে সমতলভূমির একটি পুকুরে স্নান করে শুঁড়ে জল নিয়ে আবার উপরে থানে উঠে ঠাকুরকে অভিষিক্ত করে। পরে ভক্তরা পঞ্চামৃত, বিভূতি, ডাব, তেল, চন্দন, ঘি, মধু, দই, দুধ, পনির দিয়ে অভিষেক করেন। মন্দিরের প্রধান পূজারি একজন আদিবাসী যাঁকে 'পান্ডারাম' বলা হয়। যাঁরা মানত করেন তাঁরা মাথা নেড়া করে চন্দন মেখে গন্ডি কেটে মানত শোধ করেন। বয়স্কদের সবাই গলায় মালা দিয়ে নমস্কার করে। তারপর শুরু হয় 'কাবাডি' অর্থাৎ বাজনা সহ মিছিল। কার্তিকের মূর্তি একটি, দুটি, কোথাওবা ছটি, আবার কোথাও বারোটি। কোয়েম্বাতুরে কার্তিকের মন্দিরে ওঠার পথে ময়ূর আছে এবং তার পায়ের নীচে সাপ আছে- যা ময়ূরের সর্পদমন করার ইঙ্গিতবহ। কার্তিকের বীরসত্তার পরিচয় নানা মূর্তি থেকে বোঝা যায়। তাই দক্ষিণ ভারত ও বাংলায় কার্তিক ঠাকুর লোকদেবতা রূপে পূজিত হন তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক সত্তার জন্য এবং অন্যদিকে ওড়িশা এবং পূর্ব ভারতে তিনি সন্তান দাতা হিসেবে পূজিত। লোকসংস্কৃতির ধারায় কার্তিক ঠাকুরের পুজো উপকূলীয় জীবনায়নে বিশেষ তাৎপর্যবহ।

৩) নাট্রায়ন বা নটরায়ন: শিশুরক্ষক দেবতা হিসেবে ডোম বা নিম্নশ্রেণির দ্বারা পূজিত লোকদেবতা হলেন এই নটরায়ন- যিনি তামিলনাড়ু ও কেরালার গ্রাম্য এলাকায় খ্যাত। বাংলায় এই দেবতার নাম পাঁচুঠাকুর যিনি শিশুরক্ষক ও শিশু হন্তারক এক ক্রুদ্ধ স্বভাবের দেবতা। বাংলায় নানা জেলায় এই পাঁচুঠাকুরের পূজা শিশুজন্মের পঞ্চম দিনে স্ত্রীয়াচার সহ আঁতুড়ঘরে পালিত হয়। তামিলনাড়ু ও কেরালায় লোকদেবতা নাট্রায়নের পূজা শ্মশানে অনুষ্ঠিত হয় শিশুর কল্যাণের জন্য। শিশু নামকরণের অর্থাৎ ৬, ১০, ২৩ বা ২৪ তম দিনের আগের দিন বাবা-মা ছাড়া শিশুকে নিয়ে পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তি নাট্রায়নের মন্দিরে গিয়ে ডোমের হাতে তাকে তুলে দেন। দেবতার ছাইভস্ম শিশুর গায়ে মাখিয়ে দিয়ে শিশুর সুস্থ ও সুস্বাস্থ্যের কামনা করা হয়। সকালে পুরোহিতের হাতে দিয়ে বিকালে কিংবা পরের দিন সন্তানকে ফেরানো হয়। শ্মশানে শিশুকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাওয়ার পেছনে কারণ হোল প্রেতপুরীতে নবজাতকের সঙ্গে মৃত

পূর্বপুরুষের আত্মার সাক্ষাৎ ঘটানো- যার মাধ্যমে ভৌতিক দোষ কাটিয়ে শিশুকে সমস্ত অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করা। বাংলার পাঁচুঠাকুরের পূজার উদ্দেশ্য এবং নাট্রায়নের পূজার উদ্দেশ্য গুণগতভাবে একই। এর মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির মিল লক্ষ্য করা যায়।

৪) শেররাই-কালরাই-অরি: এই তিন লোকদেবতা দক্ষিণ ভারতে যথাক্রমে বাঘ, শূকর ও ভেষজ ওষুধের দেবতা রূপে উপকূলীয় এলাকায় প্রসিদ্ধ। শেররাই, কালরাই এবং অরি তিন ভাই একই পিতার সন্তানরূপে খ্যাত হলেও গুণ ও কর্মের বিচারে পৃথক ভাবে পূজিত। বাংলায় শেররাই, দক্ষিণরায় অর্থাৎ বাঘের দেবতা, কালরাই হল কালুরায় জঙ্গল ও কুমীরের দেবতা এবং অরি হলেন বৈদ্যদেবতা অর্থাৎ পঞ্চানন্দ। নদীবিধৌত বাংলায় এই দেবতারা জল-জঙ্গলের দেবতা। চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের উপকূলীয় এবং জঙ্গল অধ্যুষিত এলাকায় এই লৌকিক দেবতাদের মন্দির এখনও রয়েছে এবং প্রথানুযায়ী পূজা চলে আসছে। 'দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির সাদৃশ্য এই যে, উপরোক্ত লোকদেবতাগণ আদিবাসীদের দ্বারা পূজিত। দক্ষিণরায় সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য- "The fact that the worship of Dakshin Roy is confined to the lower cast of Bengal."[৭]

৫) পুলিপানি: দক্ষিণ ভারতে বিশেষত তামিলনাড়ু, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যে পুলিপানি এক লোকদেবতা নামে পূজিত। মূলত তিনি বাঘের দেবতা। বাংলার দক্ষিণ রায়, গাজিসাহেব, পঞ্চন¨ যেমন বাঘের দেবতা। তেমনি পুলিপানি বাঘের লোকদেবতা, উভয়ের এই সাদৃশ্য প্রমাণ করে দ্রাবিড় সংস্কৃতির সঙ্গে বঙ্গসংস্কৃতির অপূর্ব মেলবন্ধন।

৬) নাগপূজা: দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি এলাকায় 'নাগপূজা' ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তাছাড়া এই পূজা সারা পৃথিবীতে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। মনসাপূজা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ঘটে। নদীবিধৌত বাংলার উপকূলীয় জীবনে বিশেষত পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে মনসাপূজা প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। নাগ যেহেতু শুভশক্তির প্রতীক, সেকারণে সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসাকে লোকবিশ্বাস অনুযায়ী সন্তানদাত্রী, শিশুরক্ষক বংশরক্ষক সম্পদ দায়িনী ও জ্ঞানী বলে পূজা করা হয়।

দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের ভৌগোলিক ব্যবধান ও ভিন্নতা থাকলেও লৌকিক দেব-দেবীদের প্রসঙ্গে দেখা যায় এক আত্যন্তিক সাদৃশ্য। যদিও দেবদেবীদের নাম আলাদা ও পূজোর আচার-উপাচার আলাদা, তথাপি দুই সংস্কৃতির তুলনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে পূর্ব ভারতের তথা বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির আদান-প্রদান প্রমাণ করা যায়।

তথ্যসূত্র:

১। Dass, Vijay Kumar (ed.), Comparative literature, Atlantic publishers and distributors B2 Vishal enclave, opp. Rajouri Garden, New Delhi-27, Year 2000.

২। নস্কর দেবব্রত, চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৩৯১।

৩। বসু গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, বাংলার লৌকিক দেবতা - পৃষ্ঠা ,কলকাতা ,২০২০ ,সপ্তম সংস্করণ ,জ পাবলিশিং'দে , ।১৮৮

৪। তদেব, ঐ পৃষ্ঠা - ১০৯।

৫। নস্কর দেবব্রত, দক্ষিণ ভারতের লোকদেবতা ও লোকাচার: বাংলার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৭৮।

৬। বসু গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, বাংলার লৌকিক দেবতা – পৃষ্ঠা ,কলকাতা ,২০২০ ,সপ্তম সংস্করণ ,জ পাবলিশিং'দে , ।৭৪

৭। বটব্যাল বিমলাচরণ - Royal Asiatic journal (1st) Dakshindar, a goldian of the Sundarban,1915.